ভূমিকা

ভূমিকা

সময়ের স্রোত আপন ছন্দে বয়ে চলে। তার এই প্রবাহমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও পরিবর্তিত হতে থাকে। তবে সেই পরিবর্তনের স্মৃতি-চিহ্ন তৎকালীন সময়ে রচিত সাহিত্য-সম্ভার যুগ যুগ ধরে বহন করে চলে। কাল-স্রোতের স্তর পরিবর্তনের ক্রিয়া সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, একটি নতুন দিকের শুভ-সূচনা হয়। সেই বিষয়বস্তু তথা অভিজ্ঞতাকে সমকালীন স্রষ্টাবর্গ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাসে জারিত করে তার সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করেন। কাজেই, এখান থেকে সাহিত্যিকের অগোচরেই একটি নতুন ভাববস্তু, বিষয়, আঙ্গিক ও ফর্ম-এর শুভ উদ্বোধন হয়ে যায়। এই বিষয়কেই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচকগণ 'সাহিত্যের আধুনিকতা' কী তা বুঝিয়েছেন। আসলে, এই কার্য-কারণ সূত্রেই বিশ্বের সমগ্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত। ঠিক সেইরকম-ই, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব বিশেষ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় আসে নব জোয়ার। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য নব নব ধারায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কথাসাহিত্য তার মধ্যে অন্যতম সাহিত্যধারা। কথাসাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম প্রথমে। ছোটগল্প বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। কাজেই, উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে আঙ্গিক, ভাব, ফর্মের দিক থেকে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। উপন্যাস উনিশ শতকের ফসল হলেও এর বীজ নিহিত ছিল পূর্ববর্তী সাহিত্যধারায়। তা সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় ঊনবিংশ শতকে 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) সময় থেকে।

বঙ্কিমের কলমে একদিকে ঔপন্যাসিকের শিল্পীসত্তা, অন্যদিকে নৈতিকতাবোধ – এ দু'য়ের টানাপোড়েনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যে উপন্যাসের ধারা, তা পরবর্তী সময়ে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) যাদু-স্পর্শে ভিন্ন মাত্রা লাভ করল। সমাজ-সংসারের ব্যক্তি মানুষের মনের গভীরতর স্তরকে তুলে আনবার মধ্য দিয়েই তিনি উপন্যাসের এক নব-আঙ্গিক নির্মাণ করেন। অর্থাৎ নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বিধবা রোহিনী, কুন্দনন্দিনীদের মেরে ফেলেছিলেন, রবি ঠাকুর সেই রোহিনীদের-ই আঁতের কথা তুলে ধরলেন – তাঁর 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। অপরদিকে কবিগুরুর হাতেই জন্ম নেয় সবচেয়ে জীবন-ঘনিষ্ঠ শিল্প – বাংলা ছোটগল্প। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'ভিখারিণী' গল্পটির মধ্য দিয়ে

এই বিশিষ্ট শিল্প-ধারার শুভসূচনা হয়। ধীরে ধীরে তা আরও পরিপুষ্ট ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পুরুষতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় আবদ্ধ নারীর হৃদয়-যন্ত্রণা এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষের হাহাকারকে আর এক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করেছেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর বিভিন্ন গল্প (অভাগীর স্বর্গ, হরিদাসী, মামলার ফল) ও উপন্যাসে (পল্লীসমাজ -১৯১৬, অরক্ষণীয় -১৯১৬, দেবদাস -১৯১৭, চরিত্রহীন -১৯১৭, গৃহদাহ -১৯২০ ইত্যাদি)।

পরবর্তীক্ষেত্রে কাল-স্রোত একটি কঠিন স্তরে এসে উপনীত হয়। লক্ষণীয়, এই বিংশ শতকের প্রধান দুটি ঘটনা – প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধের অভিশাপ রূপে দেখা যায় – তীব্র আর্থিক সংকট, বেকারত্ব, বিশ্বাসহীনতা, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের ভাঙন। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একদল তরুণ লেখক-গোষ্ঠী প্রকাশ করলেন 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা। এর দেখাদেখি 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকার জন্ম। যাদের উদ্দেশ্যের মূলে ছিল – রবীন্দ্র বিরোধিতা। এই সময় বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের উপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। সেই সঙ্গে অনুবাদের দৌলতে বাংলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে গৃহীত হলেন – মোঁপাসা, রোমা রোঁলা, ফ্রয়েড, মার্কস্ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সুতরাং বাংলা কথাসাহিত্য যে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবধারায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। তাই দেখা যায় – একদিকে এই পর্বের স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৯৫৭), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১ - ১৯৭৫), সুবোধ ঘোষ (১৯১০ - ১৯৮০) প্রমুখেরা প্রখর বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে থাকা নগরমুখী মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে তথা মূল্যবোধ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের বেঁচে থাকবার লড়াইকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে রূপায়িত করেছেন। অপরদিকে, ঐ একই প্রেক্ষাপক্ষে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) অন্তরালে থাকা ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে তাদের বেঁচে থাকবার পদ্ধতি অনুসন্ধানে যেমন ব্রতী হন তেমন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সমাজতন্ত্রের ও নবীন-প্রবীণ -এর দ্বন্দ্বের নানা দিক নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। আবার মূল স্রোতের বাইরে গিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) গহন অরণ্যের রূপ-রস-গন্ধকে আর এক ভাবে পরিবেশন করেছেন। সেই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮-১৯৫৬) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জীবন ও মননকে বিশ্লেষণ করেছেন। কাজেই উল্লেখ্য, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা বিশেষ একজনের বিরোধিতায় কতটা সফলতা লাভ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও, বাংলা কথাসাহিত্য যে তার বিষয়-রূপ-রীতি বদলাতে বদলাতে এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে চলছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর সময় যত গড়িয়েছে জীবনের জটিলতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, ঐ শতকের চল্লিশের দশকে সংগঠিত হয় – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, জাতি-দাঙ্গা। ফলস্বরূপ, ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, মানবিকতার অবনমন তথা মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, অবগুণ্ঠিতা নারী সমাজের কর্মদ্যোগী হয়ে উঠবার বাধ্যবাধকতা এবং সে বিষয়ে নানা জটিলতার বাতাবরণ তৈরী হওয়া, সর্বোপরি, প্রবল অস্থিরতাময় সামাজিক পরিস্থিতি ঐ পর্বের শিল্পী মননকে আলোড়িত করেছিল। তারই বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের বিশিষ্ট লেখক – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) 'দুঃশাসন', 'হাড়', 'নক্রচরিত', সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) 'গণনায়ক', 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮২) 'গিরগিটি', 'মীরার দুপুর', 'বারো ঘর এক উঠোন', সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) 'আদাব', 'খণ্ডিতা' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসে।

জীবনের এই জটিল প্রেক্ষাপটেই আবির্ভূত হন কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)। চল্লিশের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে লেখা শুরু করে ১৯৭৫ -এ চির-বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে তিনি ষাটের কাছাকাছি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও প্রায় চার'শর কাছাকাছি গল্প লিখেছেন। তাঁর এই বিপুল সাহিত্য সম্ভারের প্রতিটি সৃষ্টি-ই স্বতন্ত্র ও বর্ণময়।

আমরা জানি, প্রধানত দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে – তারা হল নারী ও পুরুষ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মানব সভ্যতা ক্রম বর্ধিত হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের দৃঢ়তা যে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে বিস্তৃত তা বলা বাহুল্য। তাদের গহন -গভীর সম্পর্কের রহস্য প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন স্রষ্টা তাদের সৃষ্টিতে উন্মোচিত করেছেন এবং বর্তমানেও করে চলেছেন। সেক্ষেত্রে একজন সামাজিক মানুষ ও শিল্পী হিসাবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রও তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্যকে আর এক ভাবে ভেদ করেছেন – যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে চলেছে। সমাজের সমস্ত বৃত্তির ও বিত্তের অন্তর্গত নারী-পুরুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কের রূপকে লেখক তাঁর বিভিন্ন রচনায় পরিস্ফুটিত করেছেন। এর প্রত্যেকটির স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন, যা পাঠকহৃদয়কে শুধুমাত্র নব নব রসে সিক্ত-ই করে না, বিস্মিতও করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সৃষ্টির শুভক্ষণ থেকেই পৃথিবীমাতার গর্ভস্থ সমস্ত জীব-প্রকৃতি পারস্পরিক কোনও না কোন নিবিড় সম্পর্কে আবৃত হয়ে আছে। যা এই বসুন্ধরার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার তথা তার অস্তিত্বের মূল একক স্বরূপ। ঠিক তেমনি বোধহয়, একজন মানবশিশু যেদিন মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করে সেদিন থেকেই সে বিভিন্ন সম্পর্কে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকে। যার প্রবাহমানতা শুধুমাত্র তার জন্মের পর জীবিত সময় পর্বে-ই নয়, মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়েও অক্ষুন্ন থাকে। একটি জাতি হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, সুস্থ-স্বাভাবিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে সমাজ। আর এই সমাজ কাঠামোর অখণ্ডতা বজায় রাখবার মূলে কাজ করে পারস্পরিক মানবিক বন্ধন ও সামাজিক কিছু মৌলিক রীতি-নীতি। মানবিক বন্ধন তথা সম্পর্কের বাঁধন, মূলত হয়ে থাকে সমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। এরা হল যথাক্রমে – নর ও নারী। এরাই সমাজের প্রধান দুটি ভিত্তিস্তম্ভ। যাদেরকে কেন্দ্রে রেখে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপগুলি আবর্তিত হতে থাকে। সমাজ-সংসারের নর-নারী সমাজ প্রদত্ত সম্পর্কের কতগুলি 'নাম'-কে জীবনে চলার পথে পাথেয় করে তারা ক্রমশ জীবন-নদীতে ভেসে চলে। অর্থাৎ নর-নারী কখনো স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে, কখনো সহোদর সম্পর্কে, আবার কখনো পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কে, আবার হয়ত বা বিশেষ কিছু আবেগের সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। যে সম্পর্কগুলি নর-নারীর সামাজিক পরিচয়কে বহন করে। কাজেই প্রতিটি মানুষের জীবনে সম্পর্কের বন্ধন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা প্রত্যেকটি মানব শিশুর ব্যক্তিত্ব-চরিত্র গঠনের মূলে কাজ করে তার পারিবারিক তথা সামাজিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল ও সম্পর্কের বাঁধনের গভীরতা। তাই লক্ষণীয় বিষয়, একজন দম্পতির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃতির প্রভাব তাদের সন্তানদের উপর প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এই কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ জীব হিসাবে তাদের উন্নতিকল্পে এবং সুষ্ঠু-স্বাভাবিক মানবজীবন অতিবাহিত করবার তাগিদে সমাজ 'মানব-সম্পর্ক'গুলির বিশেষ শ্রেণীকরণ করেছে। কাঠামোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমাজ কিছু সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে যা তথাকথিত 'বৈধ সম্পর্ক' নামে খ্যাত। অপরদিকে অমনোনীত কিছু সম্পর্ক আছে যা সামাজিক ভাষায় 'অবৈধ' তথা 'পরকীয়' সম্পর্ক নামে খ্যাত। এক্ষেত্রে বলা যায়, যেহেতু সমাজ পরিবর্তনশীল, সেহেতু সময়-দেশ-কাল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই সম্পর্কের এই বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে। তবে প্রশ্ন হল জীবন কি কোন নিয়ম-নীতি মেনে চলতে পারে ? এর উত্তর – না, পারে না; জীবনের ধর্ম গতি – এগিয়ে চলা। বিভিন্ন রকম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমেই জীবন এগিয়ে চলে।

রক্ত-মাংসে গড়া মানব-হৃদয়ের অনুভূতিগুলি বড় আপেক্ষিক। অর্থাৎ তা ক্ষণস্থায়ী। অনুভূতির চাহিদা অনুযায়ী মন তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে। মন সবসময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, অনুভূতিকে সঞ্চয় করতে চায়। তাই এই 'মন' যেভাবে চায়, যেমন করে চায় তারই ইঙ্গিতে মানবচরিত্রগুলি কাজ করে চলে। আসলে প্রত্যেকটি মানুষের 'মন'-ই হল প্রধান চরিত্র। সে-ই বাহ্যিক মানব-কাঠামোকে পরিচালনা করে থাকে। মনের চাওয়া-পাওয়ার রাজ্যে সমাজ গড়া সম্পর্কের বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখার কোন স্থান নেই। মনের কাছে নিজ সত্তাই একক ও অন্যতম। তাই সে অবাধে বিভিন্ন সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ হয়। কখনো তা হয়ে থাকে নিজের অনুমোদনে, কখনো হয়তো আপন মনের অগোচরে – অদৃশ্য ছায়ার অন্তরালে। অপরদিকে জীবনের গতি সব সময় সহজ সরল পথে এগিয়ে যেতে পারে না। নানা দ্বন্দ্ব জটিলতাকে অতিক্রম করতে করতে মানব-জীবন এগিয়ে চলে। অর্থাৎ এই একই জীবনের উপর নানা ওঠা-পড়া, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণের প্রলেপ আছে। তাই মনুষ্যজীবনে তথাকথিত বৈধ-অবৈধ সমস্ত প্রকার সম্পর্কেরই আবরণ বর্তমান। তাকে সমাজ নাই বা দিতে পারে স্বীকৃতি। কিন্তু সামগ্রিক সম্পর্কের অস্তিত্বকে তো জীবন থেকে অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকে না। কেননা, এই সম্পর্কের আবর্তগুলিই জীবনে চলার গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর এখানেই দাঁড়িয়ে বৈধ-অবৈধ সম্পর্কের সীমারেখা মুছে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র সম্পর্কের ডালির যোগফল হল সম্পূর্ণ মানব-জীবন। তাই জীবন চলার পথে প্রত্যেকটি সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রত্যেকটি সম্পর্ক 'কার্য-কারণ' সম্পর্কে প্রত্যেকের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

তাই বলা যায়, জীবন গতিশীল। তা নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে সঞ্চার করে এগিয়ে চলে। 'পদার্থবিদ্যা'র ভাষায় : প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে – বিষয়টি মানব-জীবনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিস্থিতি আমাদের মনের অনুভূতিগুলিতে ক্রিয়াশীল। ফলে একই অনুভূতি চিরস্থায়ীভাবে থাকে না। তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর এই পরিবর্তিত অনুভূতিরই প্রতিক্রিয়া মানব-জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং, একটি সম্পর্ক কখনোই এক লয়ে চলতে পারে না। তার গতিধারায় নানা বৈচিত্র্যের আগমন ঘটে। নানা রূপের সমন্বয়ে তা বহুরূপী হয়ে ওঠে। মানব সম্পর্কের এই বৈচিত্র্যময় রূপ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রত্যেকটি সৃষ্টিতেই পৃথক পৃথক। যেমন 'দ্বীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'শুক্লপক্ষ', মৌন মাধুরী', 'পরম্পরা' ইত্যাদি উপন্যাস ও 'রোগ', 'মহাশ্বেতা', 'যবনিকা', 'স্বরসন্ধি', 'রস', 'জৈব' ইত্যাদি ছোটগল্পে মানব-মানবীর সম্পর্কের এক একটি দিক ধরা পড়েছে।

অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সাধারণ প্রেক্ষাপটে লেখক নিপুণ শিল্প দক্ষতায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নর-নারীর জটিল, সর্পিল, কুটিল, বৃত্তাকার, সরল, মধুর ইত্যাদি সম্পর্কের রূপ অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সম্পর্কগুলিতেও আছে নানা তরঙ্গের আবর্ত। যার বর্ণময়তা ভিন্ন ভিন্ন চমক সৃষ্টি করেছে, যার অভিনবত্ব আমাদের শুধুমাত্র ভীষণভাবে আকৃষ্টই করে না, নতুন নতুন দিককে তুলে ধরে আমাদের ভাবিয়েও তোলে। কিন্তু দেখা যায়, তাঁর রচনাতে এই মানব সম্পর্কের বহুরূপতা যেভাবে ধরা পড়েছে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনও গবেষণা হয়নি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে "নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যে মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ" এই শিরোনামে আমার গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। আমার এই গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে যেভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছি তা এইরূপ – আমরা জানি, যে কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে অনুভব করতে হলে তাঁর জীবনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই প্রথম অধ্যায়ে রেখেছি – 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়'। এখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি তাঁর রচনাগুলিকেও তুলে ধরা হবে। শিল্পী তাঁর উপন্যাস সমূহে নর-নারী সম্পর্কের বর্ণময় রূপ কীভাবে তুলে ধরেছেন তা বিভিন্ন উপন্যাসগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে – 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারার অন্বেষণ'। লেখক উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পে মানব সম্পর্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিককে কত রকমভাবে উপস্থাপন করেছেন তা তুলে ধরতেই তৃতীয় অধ্যায়ে রাখা হয়েছে –'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ' এবং মানব সম্পর্কের এই বহুমাত্রিক ধারা অন্বেষণে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মৌলিকতা কোথায় সেই দিকটিই প্রতিফলিত করতে চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে –'মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা'। এইভাবে বিভিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়েই সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আলোচ্য গবেষণার বিষয়যটিকে সার্থক করে তুলবার চেষ্টা করব।